

২২ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা জুলাই ২০১৩

# আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা



ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করি  
সুখী সুন্দর জীবন গড়ি



ঢাকা আহ্চানিয়া মিশন



## সম্পাদকীয়

সময় থেমে থাকে না। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে মানুষের চিন্তায়। পরিবর্তন ঘটে মানুষের চলাফেরায়। পরিবর্তন ঘটে আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে। তাই দেখা যায় নারীরা আজ ঘরে বসে নেই। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও চাকরি করছেন। ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়ে অনেক নারী বড় উদ্যোক্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেছেন।

বর্তমানে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস চাষ ও কুটির শিল্পে নারীরাই বড় ভূমিকা পালন করছেন। পোষাক শিল্পে নারীরাই মূল শক্তি। এছাড়া অনেক অপ্রচলিত কাজও এখন নারীরা করছেন। যেমন- বেকারি, বুটিকের দোকান, বিউটি পার্লার ইত্যাদি।

আগে ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। আর এখন অনেকে চাকুরির বদলে নতুন উদ্যোগ নিতে চায়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। এটি সামাজিক পরিবর্তনের বড় ইংগিত।

তাই আসুন, সবাই বিষয়টি নিয়ে ভাবি। শুধু চাকরির কথা চিন্তা না করে ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এসব উদ্যোগের জন্য দরকার ইচ্ছা ও সঠিক পরিকল্পনা। তারপর প্রয়োজন পুঁজি। যার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাজ করা যায়। আর এই পুঁজি সংগ্রহ করা খুব বড় সমস্যা নয়। সরকারি বেসরকারি ব্যাংক থেকে এখন ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়া যায়। আমরা এসব ঋণ গ্রহণ করতে পারি। পছন্দের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজের অভাব ঘুচাতে পারি।

## আলাপ

২২ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৩

### সম্পাদক

কাজী রফিকুল আলম

### নির্বাহী সম্পাদক

ড. এম. এহচানুর রহমান

### সম্পাদনা পর্ষদ

রাবেয়া সুলতানা

দেওয়ান ছোহরাব উদীন

মোহাম্মদ মহসীন

### সহযোগী সম্পাদক

লুৎফুন নাহার তিথি

### অলঙ্করণ

রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

### কম্পিউটার একাফিক্স

সেকান্দার আলী খান

১	ঢাকা আহ্চানিয়া মিশনের ক্ষুদ্র...
৩	গল্প: বাসন্তী রানীর সংগ্রামী জীবন
৬	কথামালা
৭-৮	পাঠকের পাতা
৯-১০	একজন হার না মানা রেজিয়ার গল্প
১১-১২	ঈদের রান্না
১৩	উদ্যোগী নারী
১৪	ঘর সাজাতে গোলাপ ফুল

মূল্য: ২০.০০ টাকা

# ঢাকা আহুনিয়া মিশন-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ-এর জন্য ঋণ কর্মসূচি

ঢাকা আহুনিয়া মিশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৩ সালে মিশন ছোট আকারে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। যার প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন। তাই শুরু থেকেই এমন মানুষদের ঋণ দেয়া হচ্ছে, যারা প্রচলিত ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন না। এর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে তারা ঋণের টাকা আয় বাড়ানোর কাজে লাগাতে পারেন।

প্রথম দিকে এই কার্যক্রমের নাম ছিল ‘আই বি আই’। তখন গণকেন্দ্রের নব্য সাক্ষরদের আয়ব্রদ্ধিমূলক কাজে জড়িত করা হতো। বর্তমানে এই কর্মসূচিটি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নামে পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিটি সমাজের সুবিধা বঙ্গিত মানুষদের কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করছে। এই কর্মসূচি থেকে সুফল পাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। বর্তমানে এই কর্মসূচি থেকে



বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু রয়েছে। যার মধ্যে ‘ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ’ কর্মসূচি অন্যতম। সময়ের চাহিদার সাথে মিল রেখে এই কর্মসূচিটি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করছে।

মিশনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কর্মসূচি ১৩ টি জেলার ৩৮ টি উপজেলায় কাজ করছে। এই কাজ চলছে ১,১৪৩ টি গ্রাম ও ৩৬ টি শাখা অফিসের ২,৭৮৬ টি দল গঠনের মাধ্যমে।

এই প্রকল্পে ২,৬৩৬ জন চলমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছে। যার মধ্যে মহিলা ১,৪৬০ জন এবং পুরুষ ১,১৭৬ জন। উক্ত সদস্যরা বর্তমানে ২২,৪৯২,০৯০ টাকা

সঞ্চয় জমা করেছে। পাশাপাশি  
উদ্যোক্তাদের ৮৯,২৬০,৬১৯  
টাকা খণ্ড স্থিতি আছে।

বর্তমানে ক্ষুদ্রখণ গ্রহীতাদের আয় ও ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের চাহিদাও বেড়েছে। চাহিদার কথা বিবেচনা করে ক্ষুদ্রখণ কর্মসূচি ২০০৯ সালে আরও বড় আকারে শুরু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন। দক্ষতা, অর্থ ও কারিগরী সহায়তার একত্রিত রূপই হলো ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন। এজন্য প্রথমে ক্ষুদ্রখণ গ্রহীতাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা হয়। ছোট ছোট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এ কার্যক্রম সফল কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা খণ্ডগ্রহণ ও সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে তাঁদের অবস্থার উন্নতি করছে। এই প্রকল্পে সর্বমোট ১৬,৩০৪ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে কৃষি খণ্ডে ২,৭৪৭ জন, উৎপাদনশীল খণ্ডে ৩৮০ জন, ক্রয়-বিক্রয় খণ্ডে ৫,০০৭ জন ও সেবা খণ্ডে ৯৩৫ জনসহ মোট ৯,০৬৯ জনের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান হয়েছে। আর খন্দকালীন হয়েছে কৃষি খণ্ডে ২৭৬৯ জন, উৎপাদনশীল খণ্ডে ২৩৪



জন, ক্রয়-বিক্রয় খণ্ডে ৩,৭৮৮ জন, সেবা খণ্ডে ৪৪৪ জনসহ মোট ৭,২৩৫ জন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ছোট ছোট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা চলতি মূলধন বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঞ্চা করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খণ্ড কর্মসূচিতে সর্বমোট ২৯৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তাহলো-গাভী পালন, গরু মোটা তাজাকরণ, মুরগী পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), সবজি চাষ এবং বিশেষায়িত কৃষিতে পান ও কাঁকড়া চাষ। যা টেকসই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এস. এম. ইকবাল হোসেন  
প্রোগ্রাম অফিসার (মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ)  
মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচি  
ঢাকা আঙ্গুনিয়া মিশন।

# বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন

বাসন্তী রাণী দাস। একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নাম। কর্ঠোর পরিশৃম আর ইচ্ছা শক্তির কারণে আজ তিনি একজন সফল ও স্বাবলম্বী নারী হিসেবে পরিচিত। বাসন্তী একটি ব্যতিক্রমী কাজ বেছে নিয়েছেন। গ্যাসকেটের মতো ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্যাসকেট হলো একটি যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ। সাধারণত বাস, ট্রাক, মটরসাইকেল এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনে এটি ব্যবহার হয়। বাসন্তী এই গ্যাসকেট তৈরির কাজ করে নিজের এবং আরও অনেকের কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। অভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন। পরিবারের জন্য নিশ্চিত করেছেন নিরাপদ ভবিষ্যত।

বাসন্তী রাণীর বাবার বাড়ি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার খাজুরী গ্রামে। দশ ভাই-বোনের সংসারে ছিল অভাব আর অনটন। এ কারণে তয় শ্রেণির পর আর স্কুলে যাওয়া হয় নি বাসন্তীর। সংসারের অভাব ঘুচাতে বাড়ির কাছে গ্যাসকেট কারখানায় কাজ নিয়েছিলেন। সেখানে খড়কালীন শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। এভাবে



কিশোর বয়সেই বাবার সংসারে অর্থের যোগান দিতে হতো তাকে।

বাসন্তীর যখন বয়স ১৩ বছর, তখন তার বিয়ে হয়। স্বামী যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের উত্তম কুমার দাস। তার পারিবারিক পেশা ছিল চামড়া বিক্রি। উত্তম কুমারও একই কাজ করতেন। ছোটবেলা থেকেই তাই উত্তম কুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। গরু ছাগলের চামড়া সংগ্রহ করতেন। তারপর এই চামড়া কেশবপুর বাজারে বিক্রি করতেন। এতে যা আয় হতো তাই দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতেন বাসন্তী।

বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বাসন্তীর ৪টি সন্তানের জন্ম হয়। এই সময় উত্তম কুমারের ব্যবসায় হঠাৎ মন্দ দেখা দেয়। যা মালামাল ছিল, তা বিক্রি করে অর্ধেক টাকাও উঠে আসে না। ফলে নিঃস্ব হয়ে যান তারা। ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সংসারে নেমে আসে চরম দুর্দিন।

বাসন্তী চোখে অন্ধকার দেখেন। এ সময় তার মনে পড়ল বাবার বাড়ির কথা। কিন্তু তাদেরও তো অভাব! তখন তার মনে পড়ল, গ্যাসকেট তৈরির কারখানার কথা। বাসন্তী রাণী বাবার বাড়ি গিয়ে গ্যাসকেট কারখানার মালিকের সাথে পরামর্শ করলেন। ঠিক করলেন, নিজের বাড়িতে গ্যাসকেট তৈরি করবেন।

কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়াল পুঁজি। পুঁজি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পরলেন বাসন্তী রাণী। এ সময় তিনি ঢাকা আহচানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রখণ কর্মসূচি সমপর্কে জানতে পারেন। মিশনের চাঁদেরহাট মহিলা উন্নয়ন দলের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি। তারপর চাঁদেরহাট দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন পর সমিতি থেকে ১৫,০০০ টাকা খণ গ্রহণ করেন। গ্যাসকেট তৈরির কয়েকটি ডাইসসহ যন্ত্রপাতি ও কিছু শুকনো চামড়া কেনেন। প্রাথমে ছোট

আকারের কিছু গ্যাসকেট তৈরির কাজ শুরু করেন। এই গ্যাসকেট যশোরসহ আশেপাশের বাজারে বিক্রি শুরু করলেন তিনি। এতে যা আয় হতো তা দিয়ে তার সংসার মোটামুটি চলতে থাকে। আস্তে আস্তে বাসন্তী রাণীর তৈরি গ্যাসকেটের সুনাম বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চাহিদাও বাড়তে থাকে। যত উৎপাদন, তত বিক্রি। আর বিক্রি মানেই টাকা। আগের ঝণ পরিশোধ করে বাসন্তী আরো ২৫,০০০ টাকা ঝণ নিয়ে ১টি মেশিন ও কাঁচামাল কিনেন। ব্যবসা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়তি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাসন্তী রাণী এক বুদ্ধি ঠিক করেন। পাড়ার বেকার-যুবক এবং মহিলাদের দিয়ে বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে পাড়ার বেকার-যুবক এবং মহিলাদের সংগঠিত করেন। চামড়ার ওয়াসারসহ গ্যাসকেট কাটার কাজ শিখিয়ে তাদেরকে তৈরি করে নেন। প্রথম দিকে চুক্তিভিত্তিক কাজ করানো শুরু করেন।

পরের বছর আরো ৩০,০০০ টাকা ঝণ নেন তিনি। আরও ১টি মেশিন ক্রয় করেন। এভাবে তার ব্যবসা বড় হতে থাকে। এখন বাসন্তীর কারখানায় প্রায় ১০৮ প্রকার গ্যাসকেট তৈরি হয়। দেশে তার তৈরি এসব উৎপাদিত যন্ত্রের প্রচুর

চাহিদা। ফলে বিক্রির কোনো সমস্যা হয় না।

গ্যাসকেট কারখানায় কাজ করতে খুব বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এখানে প্রতিবন্ধীরাও কাজ করতে পারে। তার কারখানায় বর্তমানে তিনজন প্রতিবন্ধী কাজ করে। কারখানায় কোনো ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। ফলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় বাসন্তী রাণীর উৎপাদিত পণ্য পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করেন বাসন্তী রাণীর স্বামী উত্তম কুমার।

বর্তমানে বাসন্তী রাণীর পরিবারের সবাই এ কাজে নিয়োজিত। চারটি বড় মেশিনে চারজন শ্রমিক মাসিক ৬,০০০ টাকা বেতনে কাজ করছে। বাসন্তী রাণীর কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ২০-৩০ হাজার টাকার ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। তিনি দুই ছেলের নামে কারখানার নাম রেখেছেন। ‘শুভ-সৌরভ জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ’। গ্যাসকেট প্যাকেটের নাম রেখেছেন মেয়ের নামে, ‘রিম গ্যাসকেট’। বাসন্তী রাণীর পরিবারে অভাব দূর হয়েছে। তার চার ছেলে-মেয়েই স্কুল কলেজে পড়াশুনা করছে। তিনি নিজের নামে ৫ কাঠা জমি কিনেছেন। বসতভিটা মেরামত



করেছেন। নিজ বাড়িতে ১টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবওয়েল বসিয়েছেন। বাসন্তী রাণীর দেখাদেখি গ্রামের আরো কয়েকটি পরিবার আগ্রহী হয়েছে। তারাও গ্যাসকেট এবং ওয়াসার তৈরিতে জড়িত হয়েছে। এখন বাজিতপুর গ্রামের প্রায় ৪৫টি পরিবার এই ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরিতে জড়িত। গ্রামে গেলে দেখা যায়, প্রায় বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসকেট তৈরির কাজ চলছে। ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, বৌ-শ্বাশুড়ি সবাই আনন্দের সাথে কাজ করছে।

এভাবে বাসন্তী নিজের এবং পরিবারের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের পরিবারে এবং সমাজে বাসন্তী রাণীর সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে।

---

মোঃ জালালউদ্দীন

ব্রাংশ ম্যানেজার, কেশবপুর ব্রাংশ, মাইক্রোফিল্ম  
কর্মসূচি, ঢাকা আহচানিয়া মিশন।

---

# ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জুলাই মাসে একজন বিশ্ব বিখ্যাত মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু হয়। তাঁর নাম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

১৮২৫ সালের ১০ জুলাই পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণা জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের নাম পেয়ারা। মহাকুমা বশিরহাট। ১৯০৪ সালে তিনি হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রাল (বর্তমানে এসএসসি) পাশ করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ থেকে এফএ (বর্তমানে এইচএসসি) পাস করেন। এরপর আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁকে কিছুদিন পড়াশুনা বাদ দিয়ে চাকুরি করতে হয়। পরে ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন।

এরপর সংস্কৃত পড়ার জন্য এম.এ. তে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষকরা একজন মুসলমান ছাত্রকে তাঁদের ধর্মীয় ভাষা পড়াতে রাজি হন নি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন ‘তুলনামূলক শব্দশাস্ত্র’ বিভাগে। ১৯১১ সালে এ বিষয়ে এম.এ. পাস করেন। ১৯১৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএল পাশ করেন।

এরপর কিছুদিন বশিরহাট আদালতে ওকালতি করেন। তারপর ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত একটানা ২৩ বছর তিনি এখানে অধ্যাপনা করেন।

১৯২৬ সালে তিনি প্যারিস যান। প্যারিসে সোরবান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেন। তিনি এই উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন সম্মান অর্জন করেছেন।



১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর আবার ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেন।

অনুবাদ, পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও তিনি ১৩টি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক বই রচনা করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। বিশ্বের মোট ৪০টি ভাষা তিনি জানতেন। তিনি বলতে ও লিখতে পারতেন ১৮টি ভাষাতে।

অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাই কেউ তাঁকে বলেছেন, ‘জ্ঞান তাপস’, কেউ বলেছেন, ‘জীবন্ত অভিধান’, কেউ বলেছেন, ‘এযুগের আল-বেরুনী’।

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই তিনি ঢাকাতে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন ঢাকা হলের পাশে তাঁকে কবর দেয়া হয়। পরবর্তীতে ঢাকা হলের নাম পরিবর্তন করে তাঁর নামে ‘শহীদুল্লাহ হল’ করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)’র সাথে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

## রমজান মাস এলো

রমজান মাস এলো  
রহমত বিলাতে,  
ভুলে যেয়ে ভেদাভেদে  
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলাতে ।

তারাবির নামাজে  
মসজিদ ভরবে,  
যেন সারা মাস ভরে  
উৎসব করবে ।

মুসলিম মুমীনে  
দিনে রোয়া রাখবে,  
অবসর ও কর্মে  
ইবাদত থাকবে ।

পৃষ্ঠের মাস যে  
এই মাহে রমজান,  
ইবাদতে দাও ভরে  
মুসলিম মন-প্রাণ ।

মোসাঃ কারিমা আকতার  
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল ৩৩, বরগুনা ।



## গরিব মানুষ

আমি হলাম গরিব মানুষ, জন্ম দুঃখীর ঘরে,  
সুখের পরশ নেইকো হেথা, থাকি অনাহারে ।

সকাল বেলা ঠাণ্ডা ভাতে দুটো কাঁচা ঝাল,  
দুপুর বেলা গরম ভাতে হতেও পারে ডাল ।

রাতের দিকে ঝান্ট দেহে অধিক ক্ষুধা পাই,  
প্রতিদিনই জুটবে খাবার নিশ্চয়তা নাই ।

তেল আনতে নুন ফুরায় এই তো মোদের হাল,  
এমন করে যাচেছ কেটে হাজার দুঃখীর কাল ।

যেমন করে রাখেন আল্লাহ তাতেই আমি সুখী,  
এমনও তো আছে অনেক, আমার চেয়ে দুঃখী ।



ইসরাত জাহান  
কিশোরী সদস্য, গোলাপ গণকেন্দ্র, আয়লাপাতাকাটা, বরগুনা ।

## রোজা

রোজা এলে চলে যায়, জীবনের শত পাপ,  
মাগফিরাত নিয়ে আসে চলে যায় অভিশাপ।

রোজা এলে ক্ষয়ে যায় হিংসা বিদ্বেষ,  
সব মানুষ হয়ে যায় একসাথে একবেশ।

রোজা এলে চলে যায় শয়তান আজাজিল,  
নিয়ে আসে সবার মাঝে শান্তি অনাবিল।

লিজা আন্তার  
সৈকত গণকেন্দ্র, দক্ষিণ ইটবাড়িয়া, বরগুনা।

## রোজা এলে

রোজা এলে দিনভর না খেয়ে থাকি,  
ভালো কাজ করি আর আল্লাহকে ডাকি।

রোজা রেখে আল্লাহর চাই সন্তোষ,  
সোজা পথে চলি আর ছাড়ি সুদ-যুষ।

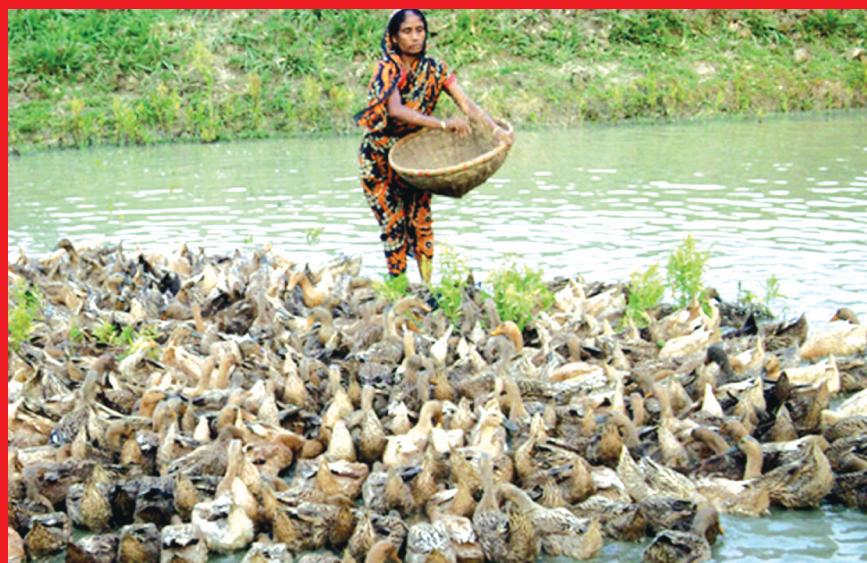
লিয়া মনি  
দোয়েল গণকেন্দ্র, জাঙ্গালিয়া, বরগুনা।

## ঈদের চাঁদ

নতুন খুশির বার্তা নিয়ে  
উঠলো ঈদের চাঁদ  
চাঁদের আলোয় আজ আমাদের  
ভাঙ্গলো খুশির বাঁধ।  
ঈদের চাঁদের আলো দেখে  
মিটলো সবার সাধ  
ঈদের খুশি থেকে যেন  
পড়ে না কেউ বাদ।

মোসাঃ রাবেয়া আক্তার  
বন্লতা গণকেন্দ্র, কাউনিয়া, বরগুনা।

# একজন হার না মানা রেজিয়ার গল্প



এক সংগ্রামী নারী রেজিয়া বেগম। অভাব অনটনের সংসার। অভাবের সাথে যুদ্ধ করে জীবনে সফল হয়েছেন তিনি। ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার এক গরিব পরিবারে গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হামিদ। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে রেজিয়া হলেন ৫ম। গ্রামের আর দশটি ছেলে-মেয়ের মতো বেড়ে ওঠা হয় নি তার। নানারকম সামাজিক সমস্যার ভিতর দিয়ে বেড়ে ওঠেন তিনি। মাত্র ১২ বছর বয়সে আব্দুল খালেকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে তার বিয়ে হয়। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার বড়তলী গ্রামে।

সতীনের ঘরে এসে বেশি দিন সুখী হতে পারে নি রেজিয়া বেগম। বিয়ের এক বছর পর রেজিয়ার কোল জুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। পুত্র সন্তান হওয়ার পর স্বামী ও সতীন মিলে জোর করে রেজিয়া বেগমকে লাইগেশন করিয়ে দেয়। যাতে আর ভবিষ্যতে সন্তান না হয়। এরপর থেকে রেজিয়া বেগমের ওপর নেমে আসে

অমানুষিক নির্যাতন। স্বামী ও সতীনের নির্যাতন সহিতে না পেরে বাধ্য হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গেলেও স্বামী কোনোরকম খোঁজ-খবর নেয় না। শেষ পর্যন্ত তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

শুরু হয় রেজিয়া বেগমের বেঁচে থাকার লড়াই। এর ১ বছর পর মোহনগঞ্জের বড়তলী গ্রামের মোঃ তাইজুল ইসলাম রেজিয়াকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাইজুল এই খবর তার পরিবারের কাছে গোপন রাখেন। তাইজুলের বাবা এই খবর শুনে রেগে যান। তিনি এই বিবাহ মেনে নেন না। তাইজুলদের বাড়িতেও থাকার জায়গা দেন না তিনি। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয় তারা। এসময় রেজিয়া বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ নেয়। তার স্বামী তাইজুল রিক্সা চালানোর কাজ নেয়। এভাবে দুঃখে কষ্টে জীবন চলতে থাকে তাদের। এক সময় রেজিয়া জানতে পারেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের কথা। জানতে পারেন মিশন এর ক্ষুদ্রোক্ত কর্মসূচি

সম্পর্কে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মিশন গরিব জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। অনেক মহিলাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমিতির সদস্য হয়েছে। ঝণ গ্রহণ করে তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে। নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। সব শুনে রেজিয়া মিশনের বড়তলী মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে যোগ দেন। সাপ্তাহিক ৫ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এটা ২০০০ সালের কথা।

এর মধ্যে মাস ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। রেজিয়া বেগম সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এরপর প্রথম দফায় রেজিয়া বেগম ৫,০০০ টাকা ঝণ গ্রহণ করেন। ঝণের টাকা দিয়ে ১০০টি ১ দিনের বয়সী হাঁসের বাচ্চা কিনে পালতে শুরু করেন। কিন্তু শুরুতে এই প্রকল্প থেকে লাভ করতে পারেন নি তিনি। তবু নতুন আশায় বুক বাঁধেন রেজিয়া বেগম। এরপর দ্বিতীয় দফায় ৮,০০০ টাকা ঝণ গ্রহণ করেন। আরও ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন। রেজিয়া বেগমের স্বামী তাইজুল ইসলাম তাকে এ কাজে সহায়তা করেন। রেজিয়া বেগমের আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি দেখে মিশন তাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর খামারের কাজটি রেজিয়া বেগমের কাছে আরও সহজ মনে

হয়। প্রশিক্ষণের পর রেজিয়া বেগমকে ২০,০০০ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঝণ প্রদান করে মিশন।

অভাব বলতে যা বুঝায়, তা রেজিয়া বেগমের সংসারে আজ আর নেই। এভাবে ধাপে ধাপে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হতে ১,৫০,০০০ টাকা ঝণ গ্রহণ করেন রেজিয়া বেগম। তার হাঁসের খামারে এখন ১০০০টি হাঁস আছে। কিস্তি দিতে রেজিয়া বেগমের কোনো সমস্যা হয় না। আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন। এখন রেজিয়া চিন্তা করেন খামারের মাধ্যমে আরও কতজনকে কাজে লাগানো যায়। সংসার, পরিবার ও সমাজে রেজিয়া বেগমের কদর বেড়েছে। এখন নিজের অধিকার, মতামত প্রদান ও পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন। সমাজে নিজের একটা সম্মানজনক অবস্থানও তৈরি হয়েছে তার। অনেক পরিবার তার মাধ্যমে উপকার পাচ্ছে।

রেজিয়া বেগম বিশ্বাস করেন আগামী ২/১ বছরের মধ্যে তার এ খামার আরও বড় হবে। আরও অনেক পরিবার তখন অভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবে। একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি এখন অন্য নারীদের কাছে অনুকরণীয়।

---

মোঃ নিয়ামুল কবীর  
প্রোগ্রাম অফিসার (ক্লিপ)  
মাইক্রো ফিন্যান্স, কর্মসূচি  
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

---

# ঈদের | রান্না

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। তাই ঈদ এলেই আমরা নতুন কোনো মজাদার খাবার খেতে চাই। কিন্তু নতুন খাবার রান্নার জন্য চাই, নতুন কোনো রেসিপি। রেসিপি কথাটির অর্থ হলো রান্নার নিয়ম। নিচে ঈদ উপলক্ষে এরকমই দুটি নতুন রেসিপি দেয়া হলো।

## লেবু ভাত

### যা লাগবে

পোলাও চাল	:	২ কাপ
পানি	:	২ কাপ
চিনি	:	৩ টেবিল চামচ
লবণ	:	স্বাদমতো
ঘি	:	২ টেবিল চামচ
লেবু পাতা	:	৬-৭টি
কুড়ানো লেবুর খোসা	:	সামান্য
কাঁচামরিচ	:	২-৩টি।

### তৈরি করার নিয়ম

চাল ভালো করে ধূয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। চুলায় পাত্র দিয়ে তাতে ঘি দিন। ঘি গরম হলে চাল দিয়ে পোলাওয়ের মতো নেড়ে দিন। যাতে চাল দলা পাকিয়ে না যায়। এবার এতে পানি, লবণ, চিনি ও ২টি লেবুপাতা দিয়ে দিন। এরপর পাত্রে



ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন। পানি শুকিয়ে এগে ঢাকনা খুলে নিন। এবার এতে লেবুপাতা ও কুড়ানো লেবুর খোসা দিন। লেবুর খোসা একটা পাতার উপরে রাখুন। পাতাটি ভাতের উপর রেখে ঢাকনা বন্ধ করে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। কিছুক্ষণ পর নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।



# তাপে কোফতা কারি



## ১. কোফতার জন্য যা যা লাগবে

মুরগির কিমা- ২৫০ গ্রাম। মরিচ গুড়া- ১/২ চা চামচ। আদা বাটা- ২ চা চামচ। রসুন বাটা- ১চা চামচ। ধনে গুড়া- ২ চা চামচ। জিরা গুড়া- আধা চা-চামচ। পেয়াজ কুচি- ১ টেবিল চামচ। ডিম- ১টা। কাঁচা মরিচ মিহি কুচি- আধা চা চামচ। লবণ- পরিমাণমতো। তেল- ভাজার জন্য। পেঁয়াজ বেরেস্তা- আধা কাপ। পুদিনাপাতা কুচি- ৪ টেবিল চামচ। কাঁচা মরিচ কুচি- ২ টেবিল চামচ। কিশমিশ- ৪ টেবিল চামচ।

## ২. কারির জন্য যা যা লাগবে

পেয়াজ কুচি- ১ কাপ। মরিচ গুড়া- ১চা চামচ। হলুদ গুড়া- ১ চা চামচ। জিরা গুড়া- ২চা চামচ। গরম মশলার গুড়া- (এলাচ ও দারুচিনি ৪টি করে) ১ চা চামচ, আদা বাটা- ২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ। পেঁয়াজ বাটা- ৪ টেবিল চামচ। টক দই- ১/৪ কাপ (ফেটে নেয়া)। চিনি- ২চা চামচ। টমেটো কেচাপ- ২ টেবিল চামচ। কাঁচা মরিচ- ৪/৫ টি। লবণ- পরিমাণমতো, পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ কাপ। টক দই- আধা কাপ। তরল দুধ-

দেড় কাপ। শুকনা মরিচ গুড়া- ১ টেবিল চামচ এবং সয়াবিন তেল- আধা কাপ।

### তৈরি পদ্ধতি:

১নং তালিকার উপকরণগুলো একসাথে মাখিয়ে নিন। মাখানো কিমা বলের মতো কোফতা বানিয়ে নিন। এবার কড়াইতে পানি গরম করে নিন। এরপর ৫-৬টি করে কোফতা ওই পানিতে দিয়ে ২ মিনিট দেকে রাখুন। কিছুক্ষণ পর কোফতাগুলোর রং বদলে জমে শক্ত হয়ে যাবে। কোফতা শক্ত হয়ে এলে পানি থেকে তুলে ট্রেতে রাখুন। এবার ২ নং তালিকার দুধ ও বেরেস্তা বাদে সব উপকরণ এককাপ পানি দিয়ে ফেটিয়ে চুলায় বসান। ভালোভাবে কষানো হলে তাতে দুধ দিন। ফুটে উঠলে কোফতাগুলো দিয়ে ওপরে বেরেস্তা ভেঙে দিন। এবার মাঝারি আঁচে রান্না করুন। ঝোল করে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে পরিবেশন করুন। মুরগি, গরু, খাসি যেকোনো কিমা দিয়ে এটি বানানো যাবে। স্বাদের জন্য সামান্য তেঁতুলের মাড় ব্যবহার করা যাবে।

ছবি ও তথ্য: লুৎফুন নাহার তিথি

# উদ্যোগী নারী

পরিবর্তন কখনো নিজে আসেনা তাকে অর্জন করতে হয়। তেমনি অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। এই বিশ্বাসকে সামনে নিয়ে নারীরা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। যা তাদের এনে দিয়েছে নিজের উপর নিজের নির্ভরশীলতা। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা ও প্রেরণা। একদিকে সে নিজের জন্য কিছু করছে। তেমনি পরিবারকেও আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

এ সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ নারীকে করেছে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। এমনই একজন স্বাবলম্বী নারী হলেন শায়লা সুলতানা। তিনি একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। অল্ল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই পোষাক বিপণনের কাজ করছেন। তিনি একজন কর্মজীবি মহিলা। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র ইচ্ছা শক্তির বলে তিনি ঘরে বসে পোষাক বিপণনের কাজ করছেন।

তার ব্যবসা ছোট থেকে বড় হয়েছে। একজন থেকে দুজন, দুজন থেকে



চারজন এভাবে তার বিপণনের প্রসার ঘটছে। তার পোষাক বিক্রয়ের মূল জায়গা হলো, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী ও সহকর্মী।

ঘর থেকে এখন অনলাইন হোম সার্ভিস, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ব্যবহার করে তিনি জিনিস বিপণন করছেন। বর্তমানে বিপণনের আধুনিক মাধ্যম হলো অনলাইন হোম সার্ভিস। দ্রুত ও সহজে সার্ভিস প্রদান করা হয় বলে অনেকেই পছন্দ করছে এই মাধ্যম।

দেশ ছাড়াও বিদেশেও বাড়ছে এর চাহিদা। এই কাজে তার স্বামী সহযোগীতা করছে। অভিভাবকরা সহযোগীতা করছে। শায়লাকে দেখে মানুষের চিন্তা, ভাবনায় পরিবর্তন হচ্ছে। পাশাপাশি আরো কয়েকজনকে এই কাজে জড়িত করছেন শায়লা। বর্তমানে একজন উদ্যোগী নারী হিসাবে শায়লা সমাজে পরিচিত।

# ঘর সাজাতে গোলাপ ফুল

সুন্দর সাজানো ঘর সবার পছন্দ। তাই সবাই চায় নিজের ঘরটি মনের মতো সাজাতে। সেটা বসার ঘর হোক, আর শোবার ঘরই হোক। আর ঘরের সৌন্দর্য অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে নানা ধরনের ফুল। আর তা যদি হয় নিজের তৈরি গোলাপ ফুল, তবে তো কথাই নেই।

ঘর সাজানোর জন্য এসব ফুল আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি। তাই ঘর সাজানো মানেই খরচ, এই ধারণা একদমই ভুল। পাশাপাশি এসব ফুল বাজারে বিক্রি করে আয়ের পথ বাঢ়াতে পারি। এই ফুল কাগজ বা কাপড় দিয়ে করা যাবে। সুতি কাপড় হলে কড়া করে মাড় দিয়ে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়। তাহলে আর দেরি কেন? আসুন, দেখে নিই কীভাবে তৈরি করব গোলাপ ফুলের বাড়।



ছবি: ইন্টারনেট

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...  
**[www.ahsaniamission.org.bd](http://www.ahsaniamission.org.bd)**

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্মদনগর মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা  
 ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।

ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯

The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission